সালাফদের ফরিয়াদ

(সাহাবি, তাবেয়ি, তাবে-তাবেয়িগণ যেভাবে দুআ করতেন)

মূল | শাইখ ওমর সুলেইমান
ভাষান্তর | নাবিলা আফরোজ জান্নাত

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

ভূমিকা

মুহাম্মাদ আল মুখতার আল শিনকিতি (রহ.) ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ আলিম। তিনি একটি মূল্যবান কথা বলেছিলেন—

> 'মানুষ আজকাল আল্লাহর ব্যাপারে এতটাই অজ্ঞতার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তারা জানেই না—তাঁকে কীভাবে ডাকতে হয়, কেমন করে রবের সাথে নিজের ব্যক্তিগত আলাপ সারতে হয়।'

ব্যক্তিগত দুআ বা মোনাজাত আসলে কেমন হওয়া সমীচীন? উত্তরে আমরা বলব—আপনার দুআ ছন্দময় বা শ্রুতিমধুর কি না, তা আল্লাহর নিকট মোটেই বিবেচ্য নয়। এমনকী আপনি যে ভাষায় প্রার্থনা করছেন, তা-ও আলাদা কোনো গুরুত্ব বহন করে না; বরং প্রধান বিষয় হলো—আল্লাহর কাছে চাওয়ার ব্যাপারে আপনি কতটা ব্যাকুল ও আন্তরিক, হৃদয়ের কতটা গভীর থেকে কথাগুলো উৎসারিত হচ্ছে।

ইমাম আহমাদ (রহ.)-কে একবার আল্লাহ থেকে বান্দার দূরত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—

> 'একটা বিশুদ্ধ হৃদয় থেকে উৎসারিত আন্তরিক দুআ।
> এটাই হচ্ছে আল্লাহর সাথে যোগাযোগের উত্তম উপায়।'

নবিদের জীবন থেকে প্রাপ্ত এবং কুরআনে বর্ণিত দুআগুলোই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনাবাক্য। রাসূল ﷺ আমাদের শিখিয়ে গেছেন—কেমন করে আল্লাহর সাথে হৃদয় খুলে ব্যক্তিগত মিনতি পেশ করতে হয়। অনুরূপ অজস্র দৃষ্টান্তের দেখা মেলে সাহাবিদের জীবনে। তাঁদের জিন্দেগি ছিল আল্লাহর প্রতি অবিচল ইয়াকিন, অপরিসীম আস্থা এবং অনন্য উপায়ে আরাধনার চমৎকার উদাহরণ।

সূচিপত্র

১১	সুন্দরে সমাপন
১৪	দরজা তাঁর রুদ্ধ থাকে না কভু
১৭	খোদার সাথে চুক্তি
১৯	অগণিত পাপ আর অফুরান ক্ষমা
২২	মৃত্যু লিখো মদিনাতে
২৫	বেহেশতে চাই নবির সঙ্গ
৩০	জানোই তো প্রভু, কতটা বেসেছি ভালো
৩৩	এক বৃদ্ধা মাতার মিনতি
৩৮	নফসের মোহ
৪১	ঝঞ্ঝার চেয়ে তীব্র সে দুআ
৪৪	দণ্ড দিয়ো না প্রভু
৪৬	আমাকে করো না পাপের নমুনা
৪৯	পরখ বিনেই তোহফা মাগি
৫১	অধমকে দাও দয়ার পরশ
৫৪	বৃক্ষের ফরিয়াদ

৫৫	তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ
৫৮	যে দুআয় মুগ্ধ রাসূল ﷺ
৬১	চেতনায় থাক বিষাদের দাগ
৬৪	অধিকতর সুন্দর করো, উজ্জ্বল করো হে
৬৬	সবর নহে, প্রার্থনা করো মুক্তি
৬৯	ফজরেই হোক যবনিকাপাত
৭১	পূর্ণ তুমি নিখুঁত আলোয়
৭৩	অনুরাগ তব সৃষ্টিকুলে
৭৫	আবৃত করো তোমার চাদরে
৭৭	হে ইবরাহিমের শিক্ষক
৭৯	তুমি রহমান, দীনতা আমারই
৮১	নিজেরে সঁপেছি তোমারই দুয়ারে
৮৩	আমাকে শামিল করো ঋদ্ধজনের কাতারে
৮৫	অন্তর মম নন্দিত করো
৮৭	দেখাও তোমার সত্য পথ

এক

সুন্দরে সমাপন

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ زَمَانِيْ اٰخِرَهٗ، وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهٗ، وَخَيْرَ اَيَّامِيْ يَوْمَ اَلْقَاكَ-

'হে আল্লাহ! আমার জীবনের শেষ মুহূর্তকে সর্বোৎকৃষ্ট সময় বানিয়ে দিন এবং শেষ আমলকে করে দিন সর্বোত্তম আমল। আর সেই দিনকে করুন আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, যেদিন আপনার সাথে সাক্ষাৎ হবে।'

আমাদের পূর্ববর্তী রাহবার অর্থাৎ সালাফগণের দুআয় জীবনের শেষ সময়ের কথা উল্লেখ থাকত। মহান আল্লাহর কাছে তাঁদের একনিষ্ঠ প্রার্থনা ছিল, জীবনের শেষ সময়গুলো যেন হয় বাকি সময়ের থেকে অধিকতর সুন্দর।

আবু বকর (রা.) তাঁর জীবদ্দশায় সব সময় নবিজির পাশে থেকেছেন। পারলে নবিজির জন্য নিজের জীবন দিতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। মৃত্যুর পরও তাঁর শেষশয্যা হয়েছে রাসূল ﷺ-এর কবর মোবারকের পাশে। এই মহান সঙ্গীকে নিয়ে নবিজি একবার বলেছিলেন—

'আবু বকর আমার পাশাপাশি জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

আবু বকর (রা.)-এর ইন্তেকাল ছিল অসাধারণ। নবিজি সপ্তাহের যেই দিনে, যেই বয়সে চলে যান, আবু বকর (রা.)ও ঠিক একই দিনে, একই বয়সে পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করেন। দুজনেই পেয়েছিলেন তেষট্টি বছরের সংক্ষিপ্ত অথচ কর্মমুখর জিন্দেগি। নবিজির আরও দুই প্রিয়তম সাহাবি উমর এবং আলি (রা.) ও একই বয়সে ইন্তেকাল করেন। জীবনের শেষ সময়ে আবু বকর (রা.) এমনকী পোশাক-পরিচ্ছদও পরতেন নবিজির আদলে। আর নিয়মিত দুআ করতেন—

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ خَيْرَ زَمَانِيْ اٰخِرَهٗ-

'হে আল্লাহ! আমার জীবনের শেষ সময়গুলো যেন সবচেয়ে সুন্দর সময় হয়।'

একবার চিন্তা করুন আবু বকর (রা.)-এর বরকতময় জীবনপ্রবাহের কথা। ইসলামের একেবারে প্রথম যুগে তিনি রাসূল ﷺ-এর সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন নবিজির

প্রাণ-প্রিয় বন্ধু, বিশ্বস্ত সহচর। পুরুষদের মধ্যে নবিজি তাঁকেই ভালোবাসতেন সবচেয়ে বেশি। শুধু তাই না; দুনিয়াতেই যারা জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আবু বকর (রা.) ছিলেন অন্যতম। এক জীবনে কত মর্যাদাই না তিনি পেয়েছিলেন! কী বরকতময় ছিল তাঁর জীবন! অথচ এতকিছুর অধিকারী হয়েও তিনি চেয়েছেন, জীবনের শেষ সময়টাই যেন হয় সবথেকে সুন্দর। তিনি আরও বলতেন—

وَخَيْرَ عَمَلِيْ خَوَاتِمَهُ-

'আমার জীবনের শেষ আমল যেন সর্বোত্তম আমল হয়।'

ভাবুন তো, সাহাবিদের মধ্যে আর কার আমল আবু বকর (রা.)-এর মতো হতে পারে? জীবনের প্রত্যেক পরতে পরতে তিনি এমনসব আমলে পরিপূর্ণ ছিলেন, অন্যান্য সাহাবিদের জন্য চিরকাল যা ছিল অনতিক্রম্য। তারপরও তিনি মহান আল্লাহর কাছে তাঁর শেষ আমলটাই সর্বোত্তম মর্যাদায় কবুলিয়াতের প্রার্থনা করেছেন। দুআ শেষ করছেন এভাবে—

وَخَيْرَ اَيَّامِيْ يَوْمَ اَلْقَاكَ-

'আমার জীবনের সেরা সময় যেন হয় সেই দিন, যেদিন সাক্ষাৎ হবে আপনার সাথে।'

এটি দারুণ শক্তিশালী ও মনোমুগ্ধকর এক দুআ, যা আবু বকর (রা.) নিজে আমল করতেন। মৃত্যুর সময় এই জান্নাতি সাহাবিই প্রখ্যাত পয়গম্বর ইউসুফ ﷺ-এর শেখানো ভাষায় বলে উঠলেন—

تَوَفَّنِيْ مُسْلِمًا وَّاَلْحِقْنِيْ بِالصَّالِحِيْنَ-

'আমাকে ইসলামের ওপর মৃত্যু দান করুন আর মিলিত করুন স্বজনদের সাথে।' সূরা ইউসুফ : ১০১

দুই

দরজা তাঁর রুদ্ধ থাকে না কভু

اِلٰهِیْ غَارَتِ النُّجُوْمُ، وَنَامَتِ الْعُیُوْنُ وَغَلَّقَتِ الْمُلُوْكُ اَبْوَابَهَا، وَبَابُكَ مَفْتُوْحٌ، وَخَلَا كُلُّ حَبِیْبٍ بِحَبِیْبِهٖ، وَهٰذَا مَقَامِیْ بَیْنَ یَدَیْكَ-

‘হে আল্লাহ! তারাগুলো নিভে গেছে, চোখগুলো নিমগ্ন নিদ্রায়। আর বাদশাহরা বন্ধ করেছে দরবার। কিন্তু তোমার দরজা তো খোলা প্রভু। প্রত্যেক প্রেমিক নির্জনে মিলিত হয়েছে তার প্রেমিকার সাথে; অথচ এখানে একান্তে আমি শুধু তোমারই সামনে দাঁড়িয়ে।’

এটি পুণ্যবতী তাবেয়ি হাবিবা আল আদাবিয়া (রহ.)-এর একান্ত ব্যক্তিগত দুআ। তিনি ছিলেন খোদাভীরু নারী, আমাদের পূর্ববর্তী নেককার বান্দাদের একজন। আবদুল্লাহ আল মাক্কিসহ আরও কয়েকজন বর্ণনা করেছেন—

‘রাত্রির মধ্যভাগে যখন খুব অন্ধকার, তখন হাবিবা আল আদাবিয়া (রহ.) আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। রবের সঙ্গে কথা বলতেন এই সব শক্তিশালী অর্থবহুল বাক্যে। আর এভাবে নামাজ ও দুআর মধ্য দিয়েই রাত পেরিয়ে ভোর হয়ে যেত। তিনি বলতেন—

“হে আল্লাহ! রাত পেরিয়ে দিনের আলো ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। আমার জানতে ইচ্ছা হয়, তুমি কি কবুল করেছ এই রাতের প্রার্থনা? যদি করতে, আমি অভিনন্দন জানাতাম নিজেকে; আর নয়তো দিতাম সান্ত্বনা। হে আল্লাহ! তোমার ইজ্জতের কসম! যতদিন বাঁচিয়ে রাখো, এ দৃঢ় শপথ আমার—

শত ভর্ৎসনাতেও মুখ ফেরাব না তোমার দরজা থেকে। হে মালিক! তোমার দয়া আর রহমত ছাড়া কিছুতেই যে পূর্ণ হয় না প্রাণ!”’

হাফিজ ইবনে রজব বলেছিলেন—

> ‘তুমি দিনেরবেলায় রাজা-বাদশাহদের দরজায় ঘুরঘুর করো। আর রাতেরবেলা সমস্ত বাদশাহের বাদশাহ যখন ডাকে, তখন তুমি সাড়া দিতে পারো না; অথচ তিনি ডেকে ডেকে তোমাকে দিতে চান।’

দুআটিতে আল্লাহর প্রতি ভয় এবং বান্দার ডাকে তাঁর সাড়া দেওয়ার আশাবাদ সমন্বিত কথোপকথনের মাধ্যমে চমৎকার রূপ পেয়েছে। ঠিক যেমন আমাদের পিতা ইবরাহিম ﷺ ও তাঁর পুত্র কাবা ঘর নির্মাণের পর তা কবুল করে নেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করেছিলেন।

একইভাবে হাবিবা আল আদাবিয়া (রহ.) আল্লাহকে বলছেন, আল্লাহ তাঁর দুআ কবুল করে নিলে তিনি খুশি হবেন। আর যদি প্রার্থনা কবুল না হয়, তাহলে তিনি ভেঙে পড়বেন না; বরং সান্ত্বনা দেবেন নিজেকে, আর লাগাতার চেষ্টায় রত থাকবেন অহর্নিশ। আল্লাহর দরজা থেকে কেউ তাঁকে সরিয়ে নিতে পারবে না। কেননা, আল্লাহর ভালোবাসা ও দয়া ছাড়া কোনো কিছুই তাঁর হৃদয়কে পূর্ণ করতে পারে না।

আল্লাহর কাছে ব্যক্তিগত কিছু চাওয়ার পর আমরা হয়তো বলি—‘হুম! দুআ তো করেছি।’ তারপর ভীষণ আত্মতুষ্ট হয়ে, এক বুক আশা নিয়ে বসে থাকি; কোনো এক দৈব ঘটনায় হঠাৎ বদলে যাবে সমগ্র জীবন। কিন্তু পরদিন যখন দুআর বিপরীতে কিছু ঘটতে দেখি, আমরা ভেবে নিই—এটা মনে হয় দুআ কবুল না হওয়ার ইঙ্গিত! আর ঠিক তখনই আমরা মহান রবের কাছ থেকে বহু দূরে সরে যাই; অথচ দুআ কবুল হয়েছে কি না—এই দুনিয়ায় কখনোই তা নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয়। আল আদাবিয়া (রহ.)-এর দুআ এই কারণেই অসাধারণ। প্রতিটা রাতই তাঁর কাছে প্রভুর দরজায় লুটিয়ে পড়ার আরেকটি অনন্য সুযোগ। ফলে কখনোই তিনি হাল ছাড়েননি; বরং প্রাণপণ দুআয় হৃদয়কে রেখেছেন নিরন্তর ব্যস্ত।

নয়

নফসের মোহ

اَللّٰهُمَّ قِنِیْ شُحَّ نَفْسِیْ-

'হে আল্লাহ! আমাকে মুক্তি দিন আত্মার লালসা হতে।'

ইবরাহিম ﷺ-কে বলা হতো সিদ্দিক তথা সৎ বা সত্যবাদী। তিনি নিয়মিত আল্লাহর কাছে দুআ করতেন কপটতা থেকে নিরাপদ থাকতে। আর জগতের সমস্ত নারীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভদ্র এবং শালীন ছিলেন মারইয়াম ﷺ। তিনি অমার্জিত আচরণকে সবথেকে বেশি ভয় করতেন। আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন যাবতীয় অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে। সৎ উপাধি পাওয়ার পরও তাঁরা উভয়ই অসদাচরণের আশঙ্কায় ভীত। মুমিনের দৃষ্টান্ত তো এমনই, সর্বাপেক্ষা শালীন হয়েও অশালীন কার্যকলাপ থেকে অল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে অহর্নিশ।

অতীতের মহান ব্যক্তিদের মধ্যে কিছু ব্যাপার ছিল, যা আমাদের সাধারণ চিন্তায় সহজে বোধগম্য নয়। আমরা বুঝে উঠতে পারি না; তাঁরা ঠিক কেন এমন করেন, ভাবেন বা বলেন। উঁচু স্তরের আমল আর পাপ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থেকেও তারা শঙ্কিত হয়ে পড়েন তাকওয়া ও পরহেজগারিতা হ্রাসের আশঙ্কায়।

রাসূল ﷺ-এর সবচেয়ে ধনী সাহাবিদের একজন ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা.)। যেমন তাঁর ধনের প্রাচুর্য ছিল, তেমনি ছিল দানের ঐশ্বর্য। মদিনায় তাঁর উটের কাফেলা হেঁটে যাওয়ার সময় মনে হতো, কোনো শত্রুদল বুঝি হানা দিলো! সেই তিনিই কাবা তাওয়াফের সময় দুআ করতেন—

'হে আল্লাহ! আমাকে হৃদয়ের প্রলোভন থেকে মুক্ত করুন।'

একদিন ইবনে আওফ একে একে সাত বার কাবা প্রদক্ষিণ করে শুধু এই একই দুআ করে যাচ্ছেন; অন্য কিছুই আর চাইছেন না। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো—

'শুধু এই দুআই কেন করছেন?'

তিনি বললেন—

> ‘যদি আমি আত্মার লোভ থেকে নিরাপদ থাকি, তাহলে হয়তো চুরি, যিনা আর অন্যান্য পাপ থেকেও দূরে থাকব।’

আত্মার লোভ ব্যাপারটা কেমন

যখন মানুষের ধন-সম্পদ অনেক বেশি বেড়ে যায়, তখন সে স্বাভাবিকভাবেই লোভী হয়ে ওঠে। তার মধ্যে এই ভাবনা কাজ করতে শুরু করে যে, অন্যকে সাহায্য বা দান করলে আমার সম্পদ কমে যাবে। এভাবে অত্যধিক সম্পদের লোভে সে হয়ে ওঠে বেপরোয়া ও দুর্নীতিবাজ। আবার সম্পদ কম থাকলেই যে মানুষ চুরি করে—তা কিন্তু সব সময় সত্য নয়। বিপুল সম্পদের মালিকও লোভী হতে পারে। সীমাহীন লোভ তখন ঈমান-আমল-আখলাক সবকিছুই ধ্বংস করে দেয়। রাসূল ﷺ বলেন—

> ‘আদমসন্তানকে যদি একটি স্বর্ণভর্তি উপত্যকাও দিয়ে দেওয়া হয়, তবুও সে আরেকটা চাইবে। যদি দুটো দেওয়া হয়, তো সে তিনটা দাবি করবে। কবরের মাটি ছাড়া আর কিছুই তার মুখ ভরাতে পারবে না।’

মাত্রাতিরিক্ত প্রাপ্তি মানুষের মাথা ঘুরিয়ে দেয়। ফলে সে কেবল আকাঙ্ক্ষাই করতে থাকে। আমরা এখানে কোনো অসহায় কিংবা দুস্থ লোকের লোভের কথা আলোচনা করছি না; বরং বলছি অত্যুগ্র লোভী ধনীদের কথা। তারা কেন এমন করে? কেননা, অনেক থাকার পরও তাদের মাথায় আরও বিচিত্র চাহিদার কথা অনবরত ঘুরতে থাকে। নিজেদের তারা সর্বদা অভাবগ্রস্ত মনে করে; যদিও তা অদৌ সত্য নয়। এটাই হচ্ছে মনের লোভ, নফসের লাগামহীন চাহিদা।

দশ

ঝঞ্ঝার চেয়ে তীব্র সে দুআ

اَرَيْتَنَا قُدْرَتَكَ فَاَرِنَا عَفْوَكَ-

'যেভাবে আপনার শক্তিমত্তা প্রদর্শন করেছেন, একইভাবে আমাদের প্রতি ক্ষমার নজির স্থাপন করুন।'

আপনার জীবনে এমন পরিস্থিতি কি এসেছে? মনে হচ্ছে—প্রচণ্ড অসহায়, চারপাশে সব এলোমেলো, কিছুই করার নেই।

অথবা ধরুন, নদী বা সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছেন। এমন সময় তীব্র ঝড়-ঝঞ্ঝার তোড়ে সব ভেঙে চুরমার হওয়ার দশা। চোখের সামনে ক্রমশ ধেয়ে আসছে নিশ্চিত মৃত্যু। ঢের বুঝতে পারছেন, এই তীব্র ঢেউ মোকাবিলার সাধ্য আপনার নেই। জীবনের এমন অসহায় মুহূর্তগুলোতেই আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারি, আল্লাহ ব্যতীত কোনো চূড়ান্ত আশ্রয় নেই। তাঁর সাহায্য ছাড়া আমরা নিতান্ত দুর্বল আর অসহায়। তাঁর সামান্যতম ইশারাতে মুহূর্তেই তছনছ হয়ে যেতে পারে আমাদের জীবন। কেননা, আল্লাহ হচ্ছেন আকবার এবং সর্বাপেক্ষা প্রতাপশালী। আবার তিনিই দয়া ও মমতার অনিঃশেষ ভান্ডার, সবচেয়ে মহান ও ক্ষমাশীল। তাঁর চেয়ে অধিক বা সমপরিমাণ দয়া কেউ কোনোদিন আর ধারণ করতে পারবে না।

পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া নির্মম ঘটনাগুলো সম্বন্ধে যখন আমরা জানতে পারি, দেখি— প্রচণ্ড ক্ষুধার যন্ত্রণায় কিংবা বোমার আঘাতে মারা যাচ্ছে শত শত নিষ্পাপ শিশু। দিকে দিকে নির্যাতিত হচ্ছে মানুষ, কিন্তু জালিম টিকে থাকছে বহাল তবিয়তে। সন্ত্রাস, নিপীড়ন, জুলুম ও বিচরহীনতা গ্রাস করছে মাশরিক থেকে মাগরিব। ঠিক তখনই প্রশ্ন জাগে, আল্লাহ কি এসব দেখেন না? কোথায় তাঁর দয়া? অথচ ওই মুহূর্তেও আল্লাহ পরম করুণাময় ও সর্বোচ্চ ক্ষমতাবান, আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি।

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। চিকিৎসকের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার সময় একজন রোগী কী চিন্তা করে? সে তো জানে না তার কী হয়েছে। কেউ বুঝিয়ে বললে হয়তো কিছুটা ধারণা পাবে।

কিন্তু চিকিৎসক যে ওষুধ খেতে বলছেন, তার কার্যকারিতা ও প্রভাব সম্পর্কে সে তেমন কিছুই জানে না। তারপরও সে ওষুধ সেবন করে, মেনে চলে অন্যান্য পরামর্শ। অর্থাৎ, জগতের সবকিছু নিজ জ্ঞানের আওতায় এনে মানুষ জীবনযাপন করে না। আমাদের পক্ষে কখনোই পৃথিবীর সবকিছু জেনে ফেলা সম্ভব নয়। এজন্য প্রায়ই আমরা অন্যের জ্ঞানের ওপর আস্থা রেখে সুপরামর্শ মেনে নেই।

সুতরাং, যখন মনে হচ্ছে আল্লাহ রহমানুর রাহিম হওয়া সত্ত্বেও চারিদিকে কেন এত অন্যায়? তখন আমাদের উচিত, আল্লাহর জ্ঞানের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখা। মানবীয় জ্ঞানের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারলে তামাম দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তার ওপর আস্থা না রেখে উপায় কী? পাশাপাশি কায়মনোবাক্যে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও সাধ্যের সর্বোচ্চ চেষ্টা জারি রাখতে হবে। কখনোই ভাববেন না, আপনার কৃতকর্ম আল্লাহর দৃষ্টি এবং জ্ঞানের বাইরে থেকে যাচ্ছে। বিশ্বাস হারিয়ে আমরা যেন এমন কথা কখনোই না বলি।

ইবরাহিম বিন আদহাম (রহ.) একবার জাহাজে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন বিচক্ষণ আলিম এবং ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি। আশপাশের সবাই তাঁর ধার্মিকতার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল ছিল। মাঝ সমুদ্রে হঠাৎ প্রলয়ংকরী ঝড় শুরু হলো। ঢেউয়ের প্রবল ধাক্কায় জাহাজ ভেঙে যায় যায় অবস্থা। ঝড়ের তীব্রতা বাড়ছে, ডানে-বামে দুলছে জাহাজ। মৃত্যুভয়ে কুণ্ঠিত জনতা ছুটে বেড়াচ্ছে দিগ্বিদিক। ইবরাহিম বিন আদহাম (রহ.) ঘুম থেকে জেগে জাহাজের ডেকে গিয়ে দাঁড়ালেন। অন্য যাত্রীরাও একে একে জমায়েত হলো তাঁর পাশে। বলল, 'আপনি কি আল্লাহকে বলতে পারেন আমাদের এই অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে?' তিনি আসমানের দিকে দুহাত তুলে ধরলেন—

> 'হে চিরঞ্জীব! সর্বৈব ক্ষমতার আধার! যেভাবে আপনার ক্ষমতা দেখিয়েছেন। ঠিক একইভাবে আমাদের ক্ষমা ও নিরাপত্তা দান করুন।'

দুআ করার সাথে সাথে ঝড় থামা শুরু করল। কমে গেল বাতাসের বেগ, উত্তাল সমুদ্র ধীরে ধীরে শান্ত হলো। নিরাপদ আশ্রয় পেল সবাই। ইবরাহিম বিন আদহাম (রহ.) পুনরায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। আল্লাহর সাথে কি অন্তরঙ্গ যোগাযোগ ছিল তাঁর!